দৈব ঔষধ

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

আজ আর তরঙ্গিণী দেবীর কিছুই নেই।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এই গ্রামের শ্রেষ্ঠা রূপসী ছিলেন তরঙ্গিণী দেবী। শুধু রূপসী নয়, বড় ঘরের বৌও ছিলেন, এখন আর কিছুই নেই। এই গ্রামের বড় গাঁতিদার—ঘনরাম রায়চৌধুরী তাঁর স্বামী। জ্বলন্ত রূপ নিয়ে প্রথম যখন তিনি শ্বশুরবাড়ি ঘর করতে আসেন, তখন তাঁর বয়েস পনেরো। সেকালে এত বছর বয়েসে বিবাহ হোতোনা মেয়েদের, কিন্তু তাঁর পিতামহ ৺রামেশ্বর চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ খুব ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। কন্যার চৌদ্দো বৎসর বয়েসে বৈধব্যযোগ থাকায় স্নেহময় বৃদ্ধ ওই বয়েসটি পার করেই পৌত্রীর বিবাহ দেওয়া ধার্য করেন।

যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসেন তিনি, ঘনরাম রায়চৌধুরীর পিতা দয়ারাম রায়চৌধুরী জীবিত। নামে দয়ারাম হোলে কি হবে, ইনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক, কঠোর শাসক ও মামলাবাজ। আবার খুব উদারও যে ছিলেন, তার পরিচয় ওই রাজীবপুরের অনেকে আজও মনে রেখেচেন। বাড়িতে কুড়ি-বাইশটা ধানের গোলাতে ধান বোঝাই,অথচ প্রজার কর্জ নেওয়া সামান্য ধানের জন্যে তাকে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে (গ্রামের লোকে বলতো ‘কাছারিবাড়ি’), এনে খুঁটিতে বেঁধে রেখে দিতেন, মারধোর করতেন, মোকদ্দমা-মামলা করে তাকে ভিটেচ্যুত করতে চাইতেন।

তরঙ্গিণী এসে দেখলেন তিনি মস্ত-বড় প্রতাপশালী শ্বশুরের আদরিণী পুত্রবধূ। শাশুড়িটি লোক ভালো নন, প্রতি কাজে সর্বদা খিট্‌খিট্ করা, সবসময় কাজের খুঁত কাটা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। তরঙ্গিণী খুব শান্ত মেজাজের বধূ ছিলেন, শাশুড়ির সমস্ত তিরস্কার বিনা প্রতিবাদে শুনে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন—একথা বলতে পারলেই বেশ শোনাতো বা মানতো বটে, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হল যে তরঙ্গিণী আদৌ তা ছিলেন না। তিনিও ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন, সমানে সমানে তর্ক-ঝগড়া করতেন। সেকালে এতে লোকে ভালো বলতো না।

স্নেহময় শ্বশুর পুত্রবধূকে কাছে ডেকে বলতেন—শোনো বৌমা, ইদিকি এসো। শসা খাবা?

—না।

—কি খাবা?

—কিচ্ছু খাবো না।

—বোসো এখানে।

—কি বলুন?

—তোমার শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করচো কেন সকালবেলা?

—উনি আমায় বল্লেন,আমি বাটনা বাটতে জানিনে।

—বলচেন বলচেন। উনি তোমার গুরুজন। তোমার কি তর্ক করা উচিত?

—না, উচিত না! আমি ছাড়বো কেন?

—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। কথাবার্তা বলতি নেই গুরুজনের সঙ্গে, ওতে লোকে নিন্দে করে।

তারপর আরম্ভ হোত সদুপদেশ—মহাভারতের দু’একটি সতীলক্ষ্মী স্ত্রীলোকের কাহিনী। ওঁর ছেলেবেলায়, একজন বড় ভালো গৃহিণী এ-গ্রামে বাস করতেন, তাঁরও পুণ্য কথা। সবই মুখে মুখে। দয়ারাম রায়চৌধুরী বই-টই পড়তে ভালোবাসতেন না। বাড়িতে পাঁজি ছাড়া অন্য বইও ছিল না।

এই সময়ে দয়ারামের স্ত্রী জগদম্বা এসে বলতেন—আমি বাপের বাড়ি যাবো, গাড়ি তৈরি করে দাও।

–কি হোলো?

—কিছু হয়নি। তোমার আদরের বৌমা নিয়ে তুমি থাকো, আমার এ সংসারে আর পোষাবে না। অকমান হতি এ-বাড়ি আমি থাকতি পারবো না।

এই সময়ে তরঙ্গিণী মুখে কাপড় দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠতেই জগদম্বা দেবী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—ওই দ্যাখো..দেখচো? আমার কথায় হেন হেনস্থা! আমি মানুষ নই! শুনলে?

তরঙ্গিণী তখনো মুখে কাপড়-গোঁজা অবস্থায় বললেন—'অকমান' কি কথা বাবা? 'অকমান' মানে কি?

জগদম্বা দেবী অমনি আঁচলের চাবির গোছা খুলে ঝনাৎ করে স্বামীর সামনে ছুঁড়ে দিলেন—এই রইলো তোমার চাবি, তোমার সংসার তুমি দেখে নাও—তোমার সোহাগের বৌমাকে নিয়ে তুমি থাকো—আমিও সব্বো চক্কত্তির মেয়ে জেনে রেখো। আমি এ-সংসারে অকমান হতি আসিনি—আসিনি—আসিনি...

গৃহিনী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দয়ারাম বিব্রত হয়ে বলে উঠলেন—আরে শোনো—শোনো—সবাই হয়েছে আমার সমান। কি গেরোতেই পড়েচি বাপু—আচ্ছা বৌমা, আবার তুমি হাসচো? আবার হাসি কিসের? না, এরকম করলে আমাকে সব বেচে-কিনে কাশী রওনা হতি হবে দেখচি।

এইভাবেই তরঙ্গিণীর কৈশোর কেটে গেল। তারপর বৃদ্ধ দয়ারাম রায়চৌধুরী একদিন শ্বাসরোগে দেহত্যাগ করলেন। ঘনরাম নিলেন বড় গাঁতি ও প্রজাপত্রের ভার। কিন্তু সংসারে শান্তি ছিল না। জগদম্বা দেবী সংসারের সর্বেসর্বা মালিক হতে চাইলেই প্রবল বাধা আসতো পুত্রবধূ তরঙ্গিণীর দিক থেকে। ঘনরাম রায়চৌধুরী নিজে পিতার মতোই দুর্দান্ত শাসক ও মামলাবাজ গাঁতিদার ছিলেন, কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী বা মা কাউকে পেরে উঠতেন না। সেখানে নিত্য দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। তরঙ্গিণী গ্রামের লোককে জিনিসপত্র দিতে ভালোবাসেন, যার চাল অভাব তাকে ভাঁড়ার থেকে শাশুড়ির অজ্ঞাতসারে চাল বার করে দেন। যার কাপড় নেই তাকে নিজের বা শাশুড়ির পুরানো কাপড় বার করে দিয়ে দেন—এসব আবার জগদম্বা পছন্দ করেন না। গ্রামের অভাবী লোকেরা বধূকে ভালোবাসে, তার কাছে নিজেদের দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করে আনন্দ পায়। কিন্তু তারা আবার জগদম্বাকে দেখতে পারে না।

গ্রামে একঘর জেলে আছে,অতি গরিব, নাম যদু জেলে। সে বার ভীষণ বাদলাবৃষ্টি ভাদ্রমাসে। যদু জেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে অসুখে পড়ে অনাহারে দিন কাটাচ্চে। একদিন তরঙ্গিণীকে তেঁতুলতলায় ডেকে যদুর মেয়ে কম্‌লি বললে—কাকিমা, বাবা আপনাকে একবার বলতে বলেচে, মোদের বড্ড কষ্ট। বাবা অসুখে পড়ে আছে, আমরা খেতে পাইনে—

—কি হয়েচে তোর বাবার?

—জ্বর হয়েচে।

—ডাক্তার দেখচে?

কমলা হেসে বল্লে, খেতি পাইনে তার ডাক্তার। আজ চাল নেই ঘরে।

—চল আমি দিচ্চি। চুপি চুপি পেয়ারাতলার জানলায় গিয়ে দাঁড়া। মা বাড়ি আছেন কি না দেখি।

তারপর উঁকি মেরে দেখলেন, শাশুড়ি ঘাটে গিয়েচেন নাইতে, অমনি ভাঁড়ার থেকে চার কাঠা চাল-পূর্ণ একটি ধামা এনে পেয়ারাতলায় এসে কম্‌লির হাতে দিয়ে বললেন—পালা!

কম্‌লি বাঁশবাগান ভেঙে ধামা-হাতে দৌড়েই পালালো।

ঝগড়াতে তরঙ্গিণীর সঙ্গে সব সময়েই তার শাশুড়ি পরাজয় স্বীকার করতেন। অমন চোখা-চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগের সাধ্য জগদম্বা দেবীর ছিল না। ছেলে মায়ের দিকে থাকতো বলেই জগদম্বা চোখ রাঙিয়ে না হোক, কেঁদেও জিতে যেতেন।

সেবার ঘনরাম রায়চৌধুরী শান্তিপুরের কাছে এক জমিদারের অধীনে নায়েবী কর্ম গ্রহণ করে সেখানে স্ত্রী নিয়ে যেতে চাইলেন।

জগদম্বা বললেন—না। বাড়ি ছেড়ে বৌ নিয়ে যাওয়া চলবে না।

ঘনরাম রায়চৌধুরী আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন—না নিয়ে গেলে এখানেও তো তোমাদের—

জগদম্বা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—নিজে গিয়ে শাসন করো গে নিজের বৌকে। নয়তো নিজে চলে যাও—সংসার কি করে শায়েস্তা রাখতি হয়, তা আমি জানি।

তা সত্ত্বেও ঘনরাম বললেন—নিয়েই যাই না হয় এবারটা। অনেকদিন এক জায়গায় রয়েচে—

মা বললেন—আমি মরবার আগে তো নয়! সে সুবিধে এখন হবে না।

অগত্যা ঘনরামকে একাই চাকুরিস্থানে চলে যেতে হোল।

সেবার শীতকালে দেশে চারিধারে বড্ড অসুখ-বিসুখ দেখা দিল। শীতের সন্ধ্যায় জগদম্বা অন্যমনস্কভাবে বসে আছেন দেখে তরঙ্গিণীর বড় ছেলে প্রতুল জিজ্ঞেস করলে ঠাকুরমা, এমন করে বসে আছো কেন?

—কিছু না, শরীরডা ভালো না—

—মাকে ডাকবো?

—না, ডাকতি হবে না। হেঁসেল ছেড়ে এখন এলি রান্নাবান্না হবে না।

—দেখি তোমার গা? এ কি! গা যে পুড়ে যাচ্ছে—

—ও কিছু না, পিত্তির ধাত তাই। তুই গিয়ে পড়গে যা।

সেইরাত্রেই জগদম্বা দেবী বিষম অসুখে পড়লেন। সংসারের অবস্থা ভালো, বাড়ির গোমস্তা রামনাথ গাঙ্গুলী প্রতুলের আহ্বানে অনেক রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উঠে এসে কর্ত্রীর হাত দেখে বললেন—জ্বর হয়েচে বেশ। নাড়ি খুব চঞ্চল। গুপী ডাক্তারকে ডাকবো?

কর্ত্রী ধমক দিয়ে বললেন হ্যাঁ, ওইটুকু এখন বাকি আছে। এই বয়েসে ডাক্তারি ওষুধ না গিললি চলচে না। ডাক্তার বাড়ি এলে, কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেবো না? সারকুমারী মত করো।

অতএব সারকুমারী-মতে চিকিৎসা চললো। এদিকের পল্লী-অঞ্চলে এই একটি চিকিৎসাপদ্ধতি বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। ননী বাগ্‌দী, নকুল মুচি প্রভৃতি সারকুমারী-মতের বড় চিকিৎসক। এরা গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে রোগী দেখে। বিনিময়ে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এরা অত্যন্ত অল্পে সন্তুষ্ট হয় বলে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাশ-করা ডাক্তাররা পেরে ওঠে না।

নকুল মুচি একটা বাঁশের চোঙা থেকে গোটা-দশ-বারো পুঁটুলি বার করে বললে—মা ঠাকরোণের কি বড্ড জলতেষ্টা পাচ্চে?

জগদম্বা বললেন—তা পায় বাবা।

—হুঁ। কি খাচ্চেন?

—ওবেলা সাবু খেয়েছিলাম।

—সাবু খাবেন না। মোদের মতে ও চলবে না। খাবেন, পান্তভাত।

—কি খাবো বাবা?

—আজ্ঞে পান্তভাত।

—তারপর?

—আগে ডোবায় ছেন করবেন, তারপর পান্তভাত খাবেন।

প্রতুল বললে—হ্যাঁ! তা না হোলে জ্বর-বিকারের সুবিধে হবে কিরকম করে?

জগদম্বা বললেন—ওকে বলতেই দাও না ভাই।

—আজ্ঞে, মোর বড়ি খেলি ডোবায় ছেন করতি হবে,

পান্ত ভাতও খেতি হবে।

—তাই হবে বাবা। তুমি ওষুধ দিয়ো।

জগদম্বার জিদ বজায় রইলো। ফল এই দাঁড়ালো, সারকুমারী-মতে চিকিৎসার তৃতীয় দিনে রোগিণীর অবস্থা দাঁড়ালো এমন খারাপ যে, সারাদিন ধরে গ্রামের শূদ্র-ভদ্র সবাই ভেঙে পড়লো বাড়িতে। অনেকে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতেও লাগলো।

গভীর রাত্রি।

তরঙ্গিণী শিয়রে বসে শাশুড়ির সেবা করচেন। ঘনরাম রায়চৌধুরীকে কর্মস্থানে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।
বড় মেয়ে রানী বললে—মা, একটা কথা—

—কী?
—বাইরে এসো, বলছি।
রানী বাইরে এসে চুপিচুপি বললে—মা, বুড়ি আর বাঁচবে না।
—তুই কি বুঝলি?
—আমি তাই বুঝলাম। এবার সেই ওষুধটা শিখে নাও না কেন?

জগদম্বা নাকি কোন্ সন্ন্যাসীর কথামত কাজ করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে লোক আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতে। জীবনে কত অম্লশূলগ্রস্ত রোগীকে যে তিনি ওষুধ দিয়েচেন...কত দূর-দূরান্তর থেকে রোগীরা এসে ওষুধ খেয়ে গিয়েচে। এ ওষুধ দেওয়ার একটা নিয়ম হচ্চে এই যে, রোগীকে স্বয়ং এসে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ওষুধ তুলে বেটে দেবেন জগদম্বা দেবী স্বয়ং।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ির এ দৈব ওষুধের কথা জানতেন। তবে রোগী তো সব সময় আসতো না, কালেভদ্রে দু'পাঁচ বছর অন্তর হয়তো কোনোদিন একজন এল। নিতান্ত দুরারোগ্য রোগ না হলে কেউ বিদেশে ওষুধ আনতে যেতে চায় না।

তরঙ্গিণী দেবী শাশুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—মা!

জগদম্বা ঘুমের ঘোর থেকে সদ্য উত্থানের সুরে বলে উঠলেন—অ্যাঁ!

—মা, একটু কমলালেবুর রস দেবো?

—উঁহু...

—মিছরির জল?

—উঁহু...

—মা, একটা কথা! আমাকে সেই ওষুধটার কথা বলে দেবেন? সেই দৈব ওষুধটা?

জগদম্বা দেবী এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন—ঘরে আর কে?

—রানি।

—ওকে যেতে বলো। ঘরে কেউ না থাকে।

রানি চলে গেল। জগদম্বা দেবী বললেন—এই শোনো। আমার তখন সোমত্তবয়েস। অম্বলশূল রোগ হোলো। ছট্‌ফট্‌ করছি রোগের যন্ত্রণায়, এমন সময়—অনেক রাত্তিরি—দেখচি কি জানো—এক সন্নিসি এসে আমায় বলচে, তোর রোগ সেরে যাবে, তুই কাল সকালে উঠে অমুক গাছের শেকড় তুলে এনে—

—কি গাছের শেকড় মা?

এ-কথার উত্তর জগদম্বা আর ইহজীবনে দিতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঘনরাম রায়চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনি টেলিগ্রাম পেয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন। তরঙ্গিণী দেবী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। ভোরের দিকে জগদম্বা দেবী পরলোকে প্রস্থান করলেন।

তারপর অনেকদিন হয়ে গিয়েচে। সংসারের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েচে। রানির বিবাহ হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েচে। ঘনরাম রায়চৌধুরী বৃদ্ধ-অবস্থায় বাড়ি বসে আছেন। প্রতুল সামান্য মাইনের চাকুরি করে, বিদেশে থাকে। সে জৌলুস নেই সংসারের। তরঙ্গিণীও বৃদ্ধা।

এ-সময় একদিন জনৈক লোক এসে ঘোড়ার গাড়ি থেকে ওদের বাড়ির সামনে নামলো। সঙ্গে একটি বৌ, দুটি ছেলে। লোকটি গাড়ি থেকে নেমে একহাতে বুক চেপে ধরে এমনভাবে আস্তে আস্তে বৌটির কাঁধে ভর দিয়ে আসতে লাগলো, যেন সে অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতর।

একটু পরেই জানা গেল, লোকটি অম্লশূলের বেদনায় কাতর হয়ে বহু দূর থেকে এসেচে। তরঙ্গিণী দেবী অম্লশূলের দৈব ওষুধ জানেন, সে শুনেচে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বল্লেন—মা, বড্ড দূর থেকে এসেচি আপনার নাম শুনে। আপনার এ—দয়া করতেই হবে—

লোকটিও বললে—না দয়া করলে মা চলবে না। আমার প্রাণ বাঁচান আপনি—বড্ড আশা নিয়ে এসেছি—

তরঙ্গিণী বললেন—তোমরা জানলে কি করে বাবা যে আমি অম্বলশূলের ওষুধ জানি?

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। রানির বিয়ে হয়েচে তাদের দেশে। রানির ননদের মুখে একথা ভদ্রলোকের স্ত্রী শুনেচেন। তাছাড়া একথা কে-জানে, তাঁদের বাড়িতে অম্লশূলের বিখ্যাত দৈব ওষুধ আছে।

তরঙ্গিণী সব কথা ভেবে দেখলেন। তিনি যে শাশুড়ির কাছ থেকে ওষুধ পাননি, একথা কাউকে বলেননি। রানিকেও কখনো বলেননি একথা। রানি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নিশ্চয় মায়ের গুণের কথা অতিরঞ্জিত করে ব্যাখ্যা করে থাকবে। খানিকক্ষণ চিন্তা করে তরঙ্গিণী বললেন—আচ্ছা ওষুধ দেবো বাবা, ব্যস্ত হয়ো না। সে তো কাল সকালে। আজ রাত্রে এখানে সবাই থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো। সেরে যাবে বাবা, কোনো ভয় নেই।

পরদিন খুব সকালে উঠে তরঙ্গিণী রোগীর স্ত্রীকে বললেন—আমার নাতনীকে সঙ্গে দিচ্ছি, তোমার স্বামীকে নদী থেকে নাইয়ে আনো। ওষুধ আমি বেটে রেখে দিচ্ছি।

বাড়ির পেছনের বনের মধ্যে ঢুকে তিনি একটা কাঁটানটের শেকড় তুললেন। মনে মনে বললেন—কোনো অপরাধ নিয়ো না ঠাকুর। আমি কিছুই জানিনে—তোমার দয়ায় যেন ওর অসুখ সারে! এতদূর থেকে এসেচে কষ্ট করে..

সেই কাঁটানটের শেকড় বেটে রোগীকে খাইয়ে দিলেন। ওরা দুজনেই চলে গেল। দুমাস পরেই রানি শ্বশুরবাড়ি থেকে এল। কথায়-কথায় একদিন মাকে বললে—আচ্ছা মা, পাঁচঘরার ভুবন মজুমদার তোমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল?

তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্‌ করে উঠলো। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন রে? হ্যাঁ, একদিন একজন লোক আর তার বৌ এসেছিল বটে। পাঁচঘরা কি ক'ঘরা তা জানিনে। সে এক মজার কথা, সে হোলো কি বাপু—আচ্ছা তুই তোর শ্বশুরবাড়িতে ওসব কথা এমন করে—

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই রানি বললে—ভুবন মজুমদার পরশু আমার শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। সে একদম সেরে গিয়েচে। দিব্যি চেহারা হয়েচে। বললে—তোমার মা আমার আর জন্মের মা ছিলেন, আমায় পুনর্জীবন দান

করেচেন। সে কত কথা। দু'খানা খেজুর গুড় দিতে এসেছিল, বলে—বৌমা, বাপের বাড়ি যাচ্চো, মাকে গিয়ে দিয়ো। তা আমি বললাম, কোনো জিনিস নেওয়ার নিয়ম নেই, নিতে পারবো না। আমার শ্বশুরবাড়ির দিকে তোমার খুব নাম—

তরঙ্গিণীর কণ্ঠ থেকে কৈফিয়তের সুর মিলিয়ে গেল। মেয়ের কাছে যে কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর বললেন না।